দেশ-বিদেশের গুপ্তচর

গঠনরীতি ও পরিকল্পনা

কৌশিক রায়

শব্দ প্রকাশন

ভূমিকা

২০২০ সালে যখন প্রথম 'দেশ বিদেশের গুপ্তচর' প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেয়েছিল, তখন জানতাম না একদিন লিখতে লিখতে তৃতীয় খণ্ডে এসে পৌঁছোব। একদিকে যেমন ভালো লাগা রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে প্রবল প্রত্যাশা পূরণের চাপ। পাঠকরা ভালো না বাসলে এই সিরিজের তৃতীয় খণ্ড লেখার প্রয়োজন হত না কখনোই। তাই তাঁদের চাহিদা সত্যিই আমি কতটা পূরণ করতে পারব, সে নিয়ে সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকি। আশা করি আপনাদের ভালোবাসার জোরে এবারেও উতরে যাব।

পূর্বের দুটি খণ্ডে বেশ কিছু গল্প, গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস নথিবদ্ধ করার পরে এই খণ্ড লিখতে বসে প্রথমে বেশ কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঘটনা তো অনেক আছে। কী লিখব, কীভাবে লিখব? সবশেষে ঠিক করলাম আমরা বেশিরভাগ মানুষ যখন গুপ্তচরবৃত্তির গল্প পড়ি তখন আমরা এই হিসেবেই পড়ি যে, একজন গুপ্তচর চুরি করে কোনও তথ্য বা অস্ত্র নিয়ে এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু এই 'চুরি' করার মধ্যেও যে কত রকম-ভেদ আছে, তা নিয়ে কথা বললে কেমন হয়! তাই এই খণ্ডে এক-একটি গুপ্তচরবৃত্তির ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলেছি। তারপরে সেই সংক্রান্ত একটি বা দুটি গল্প আপনাদের বলেছি।

এই গল্পগুলোর মধ্যে এমন কিছু গল্প আছে যা বেশ অবিশ্বাস্য, আবার যা আমাদের ভয় পাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ড লেখার সময় ব্রিটিশদের গুপ্তচর বৃত্তির ইতিহাস নিয়ে জেনেছিলাম। তারপরে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

ইনটেলিজেন্স বিভাগের কথা পড়তে গিয়েও অবাক হইনি মোটে। তবে আমার মনে বার বার একটা প্রশ্ন জাগত। রবার্ট ক্লাইভ যখন পলাশীর যুদ্ধ জিতলেন তা কি শুধুই কিছু বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে জিতলেন? তাঁর মতো পোড় খাওয়া সেনাপ্রধান কি আমাদের দেশের তিন-চারটে লোককে এতটাই বিশ্বাস করে নিতে আদৌ পারেন যে তিনি নিজে সবকিছু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন না? প্রশ্ন তো আছে, কিন্তু উত্তর দেবে কে? অবশেষ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর তাঁর বইতে উত্তর দিয়েছেন। সত্যিই ক্লাইভের একজন গুপ্তচর সিরাজের ছাউনিতে গিয়ে তাঁর সেনাবল নিজে নিরীক্ষণ করে এসেছিলেন। পরে আরও একটি বইতে এই ঘটনার অন্য একটি রূপভেদ পেয়ে শেষ অবধি আমি নিশ্চিত হই, ক্লাইভ বাংলায় আসুন আর ইংল্যান্ডে থাকুন, তাঁর সেনা প্রশিক্ষণের বেসিক রুল ফলো করেছিলেন। যেটা তাঁর মতো অভিজ্ঞ সেনাপ্রধানের কাছে অভিপ্রেত। এই বইতে আছে সে গল্প।

আবার যে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ 'র'-কে নিয়ে আমরা গর্বে বুক ফোলাই, তাঁর অন্দরেই যদি দুর্নীতি বাসা বাঁধে— তখন কেমন হয় সে করাল রূপ? সে নিয়েও থাকছে একটি অধ্যায়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক একগুচ্ছ ঘটনা তো আরও রইলই। তাই তাড়াতাড়ি পাতা উলটে ফেলুন আর হারিয়ে যান গুপ্তচরদের এই জগতে।

কৌশিক রায়
বাঙ্গালোর
মার্চ, ২০২৪

সূচি—

- পেনিট্রেশন ১১
  আটলান্টিকের দেওয়াল ১৩
  ক্লাইভের গুপ্তচর ২৮

- নেটওয়ার্ক ৩৭
  লাল পার্টি ৩৯

- কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স ৪৯
  গ্র্যান্ড শেফকে ধরার ফাঁদ ৫১

- ডবল এজেন্ট ৫৫
  ওয়াশিংটনের গুপ্তচর ৫৭
  ‘পুরা ডাল কালা’ ৬৬

- ডিফেকশন ৮০
  একজন কেরানি ৮১

- ডিসেপশন: বিভ্রান্তি ১০১
  অপারেশন মিনস্মিট ১০৩

- কোড ও সাইফার ১১৮
  কখন তোমার আসবে 'টেলিগ্রাম' ১২০

- সায়েন্টিফিক ইন্টেলিজেন্স ১৩০
  মিসাইল চুরি ১৩৩

- ইভ্যালুয়েশন : দূরদৃষ্টি ১৪২
  পার্ল হারবার ১৪৪

- হানি ট্র্যাপ ১৫২
  সেন্থিয়া : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাতাহারি ১৫৪

- প্রোপাগান্ডা ১৬৩
  অপারেশন 'ক্যানড মিট' ১৬৬

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ ১৭২
  রেশম চুরি ১৭৪

- ডিজিট্যাল এস্পিওনাজ ১৮০
  বিপদ যখন রিল্‌স ১৮২

- গ্রন্থপঞ্জি ১৮৫

আটলান্টিকের দেওয়াল

আমাদের এই গল্পের গুপ্তচর সেই অর্থে প্রশিক্ষিত এক সেনাদলের অংশ ছিলেন না। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর দেশ দখল করে নিল হিটলারের নাৎসি বাহিনী, তখন তাঁর মতোই আরও অনেক ফরাসি নাগরিক তলে তলে যোগ দিলেন গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে। এই দলটার কাজ ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর ফ্রান্সে অস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠা জার্মান অফিসগুলো থেকে জেনে নিয়ে এসে কোনওভাবে অক্ষশক্তির কাছে প্রেরণ করা। আমাদের সেই সাধারণ এক মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্পের আগে একটু বরং সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থাটা আলোচনা করে নেওয়া যাক।

সময়টা ১৯৪৩ সাল। জার্মানির সামনে ফ্রান্স ইতিমধ্যেই হাঁটু গেড়েছে। সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে জার্মান সেনার দাপট। ইতিমধ্যেই উচ্চপদস্থ ফরাসি সেনা অফিসারদের হয় নজরবন্দি করা হয়েছে না হলে হত্যা করা হয়েছে। সরকারি রিপোর্টে তাঁরা নিখোঁজ। অক্ষশক্তি তখন পালটা আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু হিটালারের নাৎসি বাহিনী যতদ্রুত সারা ইউরোপ দখল করছিল, অক্ষশক্তি সেই হিসেবে তখনও হাবুডুবু খাচ্ছে। ইংল্যান্ড প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে ফ্রান্সের ভেতরের খবর জোগাড় করার। কারণ ইংল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থান যদি দেখেন তাহলে বুঝতেই পারবেন তাঁদের ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে পদার্পণ করতে গেলে ফ্রান্স দখলে হওয়া প্রয়োজন। না হলে বারে বারে সমুদ্র পেরিয়ে রসদ আর সেনা নিয়ে ইউরোপে যাওয়া বেশ সমস্যার। এর মধ্যেই ইংল্যান্ড বেশ কিছু মহিলাদের জার্মান সংকেত সমাধানের কাজে লাগিয়েছে। সেই গল্প করতে গেলে আলাদা একটা বই হয়ে যাবে। আরও কিছু মহিলাদের গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রান্সে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে

(লেখকের 'দেশ-বিদেশের গুপ্তচর' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। সেই সঙ্গে ফ্রান্সের নাগরিকদের টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছে তারা, যাতে ফরাসি নাগরিকরা গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রক্কালে এই সময়টায় ফ্রান্স তাই অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি দুইপক্ষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। হিটলার ইংল্যান্ডের মানসিকতা বুঝেই নির্দেশ দিলেন ফ্রান্সের কোস্টাল লাইন বা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সমস্তটা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিতে। সেই দেওয়ালের উলটো দিকেই থাকবে সেনা ব্যারাক, প্রবেশ বা বাহিরের গেটওয়ে এবং নীচে দিয়ে জলের লাইন। এতে ইংল্যান্ডের কপালে পড়ল ভাঁজ। সমুদ্রের দিক থেকে প্রবেশ করতে গেলে তারা বাধাপ্রাপ্ত হবে। ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করা আর সহজ হবে না। এই দেওয়ালের নাম ছিল 'আটলান্টিক ওয়াল'। এই আটলান্টিকের দেওয়ালসহ ফ্রান্সে যে বিভিন্ন কাজকর্ম চলছিল সেগুলো সামলানোর জন্যই টোড অর্গানাইজেশন (Todt Organization) নামে একটি দপ্তর তৈরি হল। সেই দপ্তর ছিল মূল জার্মান সেনাপ্রধান পরিচালিত। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সে কাজকর্ম করার জন্য শ্রমিক তো আর জার্মানি থেকে আনা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ফরাসি নাগরিকদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হত। তারা দেওয়াল গাঁথত, রঙের কাজ করত, কাঠের কাজ করত, ইত্যাদি সব ধরনের পরিশ্রমের কাজগুলো তারাই করত। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু সাধারণ ফরাসি নাগরিক এইসব কাজে লেগে গেলেন। যদি কিছু সংবাদ জোগাড় করা যায় এই আশায়।

সেই সময় ফ্রান্সের নাগরিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেঞ্চুরি ("Centurie") দল, যারা আসলে ছিল OCM (Organisation Civile et Militaire) বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগখানা ১৯৪০ সালে গড়ে উঠেছিল। নরম্যান্ডি ও জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সে এই দল গোপনে কাজ করত। ১৯৪২ সাল নাগাদ সেঞ্চুরি দলে প্রায় চল্লিশজন সদস্য ছিল। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে জার্মানি আটলান্টিক ওয়াল তৈরির কাজ পরিকল্পনা করে। আর আমাদের গল্প শুরু হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে। নরম্যান্ডির কন (Caen) বন্দর শহরের মেয়রের অফিসের বাইরে একটা মোটা হলদে কাগজে লেখা একখানা নোটিশ ঝুলছিল। ৭ই মে, বৃহস্পতিবার, রেনে ডাচেজ (Rene Duchez) এই নোটিশখানা দেখে থমকে যান। নোটিশের মূল বক্তব্য হল ফ্রান্সের টোড অর্গানাইজেশনের অফিসে টুকটাক মেরামতির আর রঙের কাজ হবে। আগ্রহীরা যেন একটা খরচপাতির টেন্ডার জমা করেন। রেনে ছিলেন এই সেঞ্চুরি দলের একজন সদস্য তাই তিনি এই সুযোগকে এক সুবর্ণ সুযোগ হিসেবেই দেখলেন। তিনি ভাবলেন যদি টোড অফিসে ঢুকে অন্তত কিছু গুপ্ততথ্য নিয়ে বেরিয়ে আসা যায় তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও সুবিধা হবে ফ্রান্সের। কিন্তু সমস্যা বাঁধল অন্য জায়গায়। আনুমানিক খরচ-খরচার যে তালিকা জমা করার তারিখটি নোটিশের নীচে

দেওয়া সেটি ছিল গতকাল, বিকাল পাঁচটা অবধি।

রেনে ডাচেজ

রেনে কিছুক্ষণ সেখানেই বসে ভাবলেন। এই টোড সংস্থাই আটলান্টিকের দেওয়ালটি বানাচ্ছে। তাই যদি সেখানে ঢুকে পড়ে কিছু গুপ্ততথ্য জেনে ফেলা যায় তাহলে এর থেকে ভালো আর কিছুই হয় না। তাঁর বাকি সহকর্মীদের তুলনায় তাঁর প্রাপ্ত সংবাদ যে অনেক মূল্যবান হবে এটা তিনি খুব সহজেই বুঝলেন। পেশাগতভাবে রেনে ছিলেন একজন রংমিস্ত্রি। তাই দেখলেন এই সুযোগটা নেওয়াই যায়। রেনের স্বভাবটা ছিল বড়ো অদ্ভুত। তিনি মাঝে মাঝেই বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে গল্প দিয়ে লোকজনকে বোকা বানাতে পারতেন। আর জার্মানদের সে সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ করলেও জার্মানরা তা বুঝতে পারত না। সম্ভবত জার্মানদের নাকের ডগায় বসে তাদের বোকা বানানোর এই লোভটাও রেনে সামলাতে পারছিলেন না।

তিনি সেই অফিসের সিভিল বিভাগে গিয়ে দেখা করলেন। সেখানে কর্মরত কর্মী মিস্টার পোস্টেল তাঁকে বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, "আপনি মশাই বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। গতকাল অবধি সমস্ত যা আবেদনপত্র আমরা পেয়েছি তা পাঠিয়ে দিয়েছি।" রেনে তাঁর তুখোড় বুদ্ধি আর চাটুকারিতার মাধ্যমেই পোস্টেলকে খুব তাড়তাড়ি নিজের পক্ষে করে ফেললেন। তখন পোস্টেল দুঃখপ্রকাশ করে বললেন, "একটা সুখবর হল, সব আবেদনপত্র দেওয়া হয়ে গেলেও টোড অফিস কোনো আবেদন এখনও মঞ্জুর করেনি। এখন এক মাত্র উপায় হচ্ছে, আপনি বরং সরাসরি টোটের অফিসে গিয়ে কথা বলুন।"

রেনে তাঁর মিনিভ্যানের মতো গাড়িতে ফিরে এলেন। সেটা দ্রুত চালু করে এভিনিউ বাগালেতে ধরলেন। কন নগরের টোড দপ্তরখানা একটা ছোটো অফিসমাত্র। রেনেকে যেতে হবে সেন্ট মালোর প্রধান দপ্তরে। সেই সময়ে জার্মানরা সেন্ট মালোর তিনটি শহরে টোডের প্রধান দপ্তর খুলেছিল। একটি ভুয়ো দপ্তর। সেখানেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাইরে থেকে অন্তত বেশি রাখা হত যাতে অক্ষশক্তির গুপ্তচর দলের নজর সব সময় সেটার ওপরে থাকে। দ্বিতীয় দপ্তরে প্রশাসনিক কাজকর্ম হত আর শেষ দপ্তরে হত মানচিত্র সংরক্ষণ ও বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়া সংক্রান্ত কাজ। এই তৃতীয় দপ্তরটিই দেখতে গেলে সবথেকে গুরুতপূর্ণ ছিল। রেনেসহ ফ্রান্সের সাধারণ নাগরিকরা জানতেন না কোন বিল্ডিং-এ কী কাজ হয়! ভাগ্যগুণেই বলুন আর যা-ই হোক,

ক্লাইভের গুপ্তচর

আজকে আমরা পুরোনো ইতিহাস বইতে ফিরে যাব। ১৭৫৭ খেয়াল আছে? বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা রবার্ট ক্লাইভের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। ইংরেজরা এদেশে ব্যাবসা করতে এসে হয়ে উঠলেন এদেশের শাসনকর্তা। ইতিহাস বইতে এটুকুই দেওয়া আছে। কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটি বা ঘটনাটি এতটাও সরলরৈখিক নয়। আপনারা বিভিন্ন জায়গায় মিরজাফরের অন্তর্ঘাতের কথা পড়েছেন, কিন্তু যা পড়েননি তা হল রবার্ট ক্লাইভের অত্যন্ত বিচক্ষণ ও কুটিল রণনীতি। এই পুরো ঘটনার পেছনে গুপ্তচারবৃত্তি এবং কোভার্ট অপারেশন এই দুটির একটি বিরাট ভূমিকা আছে। যেটা নিয়ে সচরাচর কথা বলা হয় না। আজকে সেই গল্পটা বলব।

১৬৯০ সাল বর্ষাকাল। ছোটো-বড়ো কয়েকটি জাহাজ এসে ভিড়ল সুতানুটিতে। বর্তমানে জায়গাটি কলকাতার উত্তর দিকে মদনমোহনতলার কাছাকাছি। জাহাজটিতে এসেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাবসার তৎকালীন কর্তা জব চার্নক ও সৈন্যদের প্রধান ক্যাপ্টেন ব্রুক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে আসছে সেই সময় তারা মূলত ব্যাবসার উদ্দেশ্যে এসেছিল। তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামে কুঠি নির্মাণ করে ব্যাবসা করার। চট্টগ্রাম তখন একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। ইংরেজদেরও আগে সেখানে এসেছিল পর্তুগিজরা। তবে ইংরেজ বা পর্তুগিজ কেউই চট্টগ্রামে পাকাপাকি ভাবে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করার অনুমতি পায়নি। চব্বিশে আগস্ট দুপুরবেলায় নৌকাগুলি সুতানুটিতে এসেছিল দ্বিতীয়বারের জন্য। এর আগেও চার্নক কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু কুঠি তৈরির ব্যাপারে ভাবেননি, মাঝে দু'বছর ছিলেন মাদ্রাজে।

১৬৯০ সালে যখন চার্নক কলকাতায় পা দিচ্ছেন তখন ইংরেজদের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তারা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর তিনটি গ্রাম স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে বাণিজ্য শুরু করেন। তৎকালীন কলকাতার অবস্থাটা পাণ্ডবর্জিত জঙ্গলাকীর্ণ বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না। এখন যেখানে ময়দান সেখানেই সেই সময় ছিল বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল আর তার ভেতর দিয়েই ছিল কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটি মাত্র বড়ো রাস্তা। সে রাস্তায়ও রাতে যাওয়া সহজ ছিল না। ডাকাতের ভয় লেগেই থাকত।

কলকাতার আসার পরে মাত্র তিন বছর জব চার্নক বেঁচে ছিলেন। ১৬৯৩ সালে তিনি মারা যান। ঠিক সেই সময় বাংলায় একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল যা ইংরেজদের পায়ের নীচের মাটি শক্ত করে দিল। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর অঞ্চলের জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহ করলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খাঁ। বর্ধমানের রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে শোভা সিংহ হুগলি ও চব্বিশ পরগনার দিকে যাত্রা করে। চুঁচুড়া, চন্দননগর ও সুতানুটির ডাচ, ফরাসি ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁয়ের শরণাপন্ন হলেন। নবাব জানিয়ে দিলেন, 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা'। অর্থাৎ যারটা সে-ই দেখে নাও। বিদেশি বণিকরা বাণিজ্য করতে না পারলে নবাবের টান শুল্ক বিভাগে পড়বে। বিদ্রোহের বাতাবরণে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সমস্যা, কাজেই তাদের কুঠিবাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিলেন নবাব। সুযোগসন্ধানী ইংরেজরা কুঠিবাড়ি নির্মাণের নামে গড়ে ফেললেন এক দুর্গ। সে দুর্গের নাম তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজার নাম অনুসারে রাখা হলো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। দুর্গের ওপরে রাখা হয়েছিল দশটি কামান। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘোষণা হলেও রহিম খাঁ বাংলার একটা বড়ো অংশ দখল করে নেন। এই খবরে রুষ্ট ঔরঙ্গজেব বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁকে অপসারিত করে সুবেদার পদে নিযুক্ত করলেন আজিম-উশ-শানকে। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ-র পুত্র জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ করলেন এবং পরে আজিম-উশ-শানও তাঁদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে জাঁকিয়ে বসার চেষ্টা শুরু করল বটে, কিন্তু বাংলায় বিদ্রোহের আবহে সমস্যা লেগেই রইল। এসব সমস্যা কাটাতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি দল দিল্লিতে বাদশার সঙ্গে দেখা করতে গেল। দিল্লির মসনদে তখন মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের নাতি ফারুকশিয়ার বসেছেন। যে সময় এই দলটি দিল্লিতে পৌঁছালো, ঠিক সেই সময় মুঘল বাদশার এক রাজপুত মহিলার সঙ্গে বিবাহ আটকে রয়েছে। বিবাহ আটকে থাকার কারণ ফারুকশিয়ারের শারীরিক অসুস্থতা। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে

ততদিন মুঘল বাদশার সঙ্গে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। আর ওদিকে যতদিন না মুঘল বাদশা সুস্থ হচ্ছেন, ততদিন বিয়েও সম্ভব নয়। কোম্পানি সদস্যরা দিল্লিতে অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইংরেজ দলের প্রধান জন সারমান পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। দামি দামি উপঢৌকন দিয়েও লাভের লাভ কিছুই হচ্ছিল না। ফারুকশিয়ারের রাজসভার হাকিম-কবিরাজ কেউই সম্রাটের উপশম করতে পারলেন না। ফারুকশিয়ারের আসলে পশ্চাৎদেশে একটি ফোড়া হয়েছিল। যেটির কারণেই তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। এই খবর ইংরেজদের কাছে পৌঁছানো মাত্রই জন সারমান একটা সুবর্ণ সুযোগ দেখলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই দলে ছিলেন ইংরেজ ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিল্টন। তাঁরা বাদশার সামনে হাজির হয়ে ইংরেজ ডাক্তারকে একটি সুযোগ দিতে বলেন। ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিল্টন অস্ত্রপচার করে মুঘল বাদশার ফোঁড়াটি কেটে বাদ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফারুকশিয়ার সুস্থ হয়ে উজ্জীবিত বোধ করতে থাকেন। তিনি খুশি হয়ে ইংরেজদের কলকাতা সহ আরও ২৪টি গ্রামের জমিদারি বকশিশ দিলেন। যদিও এই চব্বিশটিকে গ্রাম না বলে বলা উচিত ২৪টি পরগনা উপহার দিয়েছিলেন। এই ২৪টি পরগনা থেকেই এসেছে, ২৪ পরগনা, যা পরে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ২৪ পরগনায় বিভক্ত হয়েছে।

১৭৪০ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হলেন আলিবর্দি খাঁ। দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটলো এইবার। নাগপুর থেকে মারাঠারা এসে বাংলাদেশ আক্রমণ করে বসল। সেসময়ের মারাঠা অধিপতি ছিলেন রঘুজি ভোঁসলে। যদিও আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁর সেনাপতি ভাস্কর রাম বা ভাস্কর পন্ডিত। সেই সময়ের মারাঠাদের আক্রমণের ঘটনাকে মনে রেখে বাংলায় প্রচুর গান ও কবিতা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।

লুটি বাংলা লোক করিল কাঙাল
গঙ্গা পার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।

মারাঠারা নদীর ওপর নৌকা দিয়ে পুল তৈরি করে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছিল। সেখানেই প্রচুর ধনী ব্যবসাদারদের গৃহ তারা লুটপাট করেছিল। মুর্শিদাবাদ-এর অন্যতম ধনী জগৎ শেঠের বাড়ি লুট করে তারা প্রায় সেই সময়ের বাজারে আড়াই কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। বর্গিদের আক্রমণের ভয়ে কলকাতা তখন ঠক-ঠক করে কাঁপছে। যদিও সে আক্রমণ কলকাতামুখী হয়নি। তার আগেই আলিবর্দি খাঁ আলোচনা করার অছিলায় সভায় ডেকে ভাস্কর পণ্ডিতকে খুন করলেন। মারাঠারা ছত্রভঙ্গ হয়ে দেশে ফিরে গেল। যখন বর্গিহানা চলছে তখন কলকাতার চারিদিকে এক খাল কাটার প্রকল্প শুরু হয়েছিল। যাতে সেটা গঙ্গার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কলকাতাকে বর্গি হামলা থেকে রক্ষা করা যায়। উত্তরের শহর পরিক্রমা করে এন্টালি বাজারের কাছে এই

খাল এসে শেষ হয়ে যায়। ইংরেজরাও মারাঠাদের আক্রমণ ঠেকাতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কামান জড়ো করেছিল। ব্যাবসাদারেরা সেই সময় কলকাতাকে তাই অনেক বেশি নিরাপদ মনে করে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন।

নবাব সিরাজউদৌলা

নবাব আলিবর্দি খাঁ মারা যান ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল। এর পরেই সিরাজউদৌলা বাংলার নবাব হন। সিরাজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাঁর বেশিরভাগ সভাসদ থেকে অধীনস্থ রাজারা তাঁর বিরুদ্ধে রাগ পোষণ করছিলেন। ইংরেজদের বাংলায় কুঠি ও দুর্গ নির্মাণকে সিরাজ ভালো চোখে দেখতেন না। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হিসেবে সাহসী হলেও ভালো শাসক বা রাজনীতিজ্ঞ দুটোর কোনওটাই ছিলেন না। ফলে ইংরেজ ও ফরাসি দুই দলের সঙ্গেই তার সংঘাত শুরু হল। বর্গি আক্রমণকে কেন্দ্র করে চন্দননগরে ফরাসিরা দা ওরলাঁ ও ইংরেজরা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দুটি মজবুত করে গড়ে তুলেছিল। সিরাজ এতে অখুশি হয়ে দুই পক্ষকেই চিঠি লিখে নতুন নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফরাসিরা সে-কথা আংশিকভাবে মেনে নিলেও ইংরেজরা নবাবের নির্দেশ মানল না।

ঠিক এই সময় ঢাকার শাসনকর্তা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস বিপুল অর্থ নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। এই বিপুল অর্থ ছিল নবাবের রাজস্বের টাকা। ফলে সিরাজ খেপে গিয়ে ইংরেজদের কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। ১৭৫৬ সালে ক্রুদ্ধ নবাব কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নিলেন। বেশ কিছু ইংরেজ কর্মী ও বণিকদের তিনি বন্দি করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে গেলেন। মজার ব্যাপার এর মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসও ছিলেন। তখন অবশ্য তিনি সামান্য এক কর্মচারী।

এর পরে নবাব কলকাতা দখলের উদ্দেশ্যে ১৭৫৬ সালের ১৫ জুন চিৎপুরে সৈন্য ও বড়ো কামান নিয়ে উপস্থিত হলেন। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা পরাজিত হল। গভর্নর ড্রেক সাহেব ও আরও বেশ কিছু ইংরেজ পালালেন ফলতা। বাকি সৈন্যদের একটি ছোট্ট ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। প্রায় ১৪৩ জন। অনাহারে ও শ্বাসকষ্টে এর মধ্যে মাত্র ২৩ জন বেঁচে ছিলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'অন্ধকূপ হত্যা' বা 'কলকাতা ব্ল্যাক' হোল নামে বিখ্যাত।